কলকাতা এক বহুরূপী

কলকাতার তখন এখন

অভিজিৎ তরফদার

(লেখক, চিকিৎসক)

বার্ধক্যের একটা লক্ষণ, পুরনোকে ভালো এবং এখনকার সময়কে খারাপ বলা। পুরনো কলকাতা এবং হালের কলকাতার তুলনা করতে বসলে এই প্রবণতা এড়ানো শক্ত। কাজেই, যা সত্য অর্থাৎ বার্ধক্য, তা স্বীকার করে নিয়ে লিখতে শুরু করাই ভালো।

যদিও জন্ম কলকাতায়, আমার ছোটবেলাটা কেটেছে বর্ধমানে। ছুটিছাটায় কলকাতা আসা হত, বড়মাসির কাছে, বরানগর। মাসিরা অবশ্য বরানগরকে কলকাতা বলত না। ঠাকুর দেখতে সবাই মিলে কলকাতা যাওয়া হত। কুমোরটুলি, আহিরিটোলা বাগবাজার। একবার ওইরকম পুজোয় ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করা হল ফাঁকা রাস্তার দুই প্রান্তে যুযুধান দুই পার্টি, রাস্তার মাঝবরাবর আমরা কটি প্রাণী। দু'দল দুই প্রান্ত থেকে নতুন বাঁধা সুতলি-পাকানো বোমা বিরোধীদলের উদ্দেশে ক্ষেপণ করছে। কেউই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারছে না। বোমাগুলো রাস্তার মাঝবরাবর এসে থেমে যাচ্ছে। থেমে ঠিক যাচ্ছে না, বিস্ফোরিত হচ্ছে এবং আমরাই সবচেয়ে

কাছাকাছি থাকায় কয়েকহাত দূরে বোমা ফেটে কানে তালা লাগিয়ে দিচ্ছে। বারুদের গন্ধ, ধোঁয়া, আওয়াজ আমাদের হতচকিত অবস্থা। হঠাৎই গলির ভেতর থেকে এক প্রায়-বৃদ্ধ বেরিয়ে এসে মা-মাসি-বাবা-মেসো-আমরা দুভাই-আর মাসতুতো দিদিকে একরকম হিঁচড়ে টেনে একটা রকের আড়ালে নিয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ পর ওদের স্টক ফুরিয়ে গেলে নিজেই পথ দেখিয়ে বি. কে. পাল অ্যাভিনিউ থেকে বড় রাস্তায় নিয়ে গিয়ে ট্রামে তুলে দিয়ে এসেছিলেন।

একাত্তরের সেই অভিজ্ঞতার পর আমাদের কলকাতায় পুজো দেখা বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু কয়েকটা জিনিস এখন বুঝতে পারি। প্রথমত, বোমাবিষয়ে ওই যুবকদের অভিজ্ঞতা ছিল নিতান্তই কম। কারণ ওই বোমাগুলোর কোনও স্প্লিন্টার ছিল না। থাকলে আজ আমি বসে কলম চালাতে পারতাম না। দ্বিতীয়ত, চল্লিশবছর পরেও সাধারণ মানুষের অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি। যুযুধান বিপরীত মেরুর রাজনীতিকরা যে অস্ত্রগুলি একে অপরের উদ্দেশে বর্ষণ করেন, তার কোনওটাই লক্ষ্যভেদ করে না। তারা বর্ষিত হয় মাঝখানে থাকা অগণিত সাধারণ মানুষের ওপর। আধুনিক বিস্ফোরকগুলিতে অবশ্য স্প্লিনটার থাকে। তৃতীয়ত, এখন কোনও হাত অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে না জীয়নমন্ত্র নিয়ে। এই মৃত্যু উপত্যকায় জীবনের শেষ আশ্বাসটুকুও ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে।

প্রথম যেদিন সত্যি সত্যি কলকাতায় এলাম, সেটা ডাক্তারিতে ভর্তি হওয়ার আগে কাউন্সেলিং ইত্যাদির জন্য। ষোলো-সতেরো বছরের সেই কিশোরকে বাবা-মা একাই ছেড়ে দিয়েছিলেন। মেডিক্যাল কলেজে এসে সেদিন আরও যে চল্লিশ-পঞ্চাশজনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তারাও ছিল নিঃসঙ্গ। এম. এ. পরীক্ষার সময়েও সন্দেশ আর ডাবের জল নিয়ে হলের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা মায়েরা সেসব আজ কল্পনাতেও আনতে পারবেন না। কিন্তু সেদিনের যে স্মৃতি আজও আমার মনে জ্বলজ্বল করছে তা হল, দুপুরে ভাত খেতে প্রেসিডেন্সির উত্তরে গলির মধ্যে যে হোটেলটিতে ঢুকেছিলাম, সেখানে আমার প্রিয় পার্শে মাছের ঝাল দিয়ে খাওয়া শেষ করে টাকা মেটানোর সময় খুবই সঙ্কোচের সঙ্গে বলেছিলাম, আমাদের থালায় একটা চুল পড়েছিল, অন্যদের যেন একটু দেখে খাবার দেওয়া হয়। মালিক, খালি গা, শুভ্র উপবীত, সঙ্গে সঙ্গে উঠে গিয়ে তখনও পড়ে থাকা থালায় চুলটা নিজের চোখে দেখে এসে আমাকে খুব বকাবকি করেছিলেন, কেন আমি আগে বলিনি এবং বহু অনুরোধ করা সত্ত্বেও আমার কাছ থেকে কোনও দাম নেননি। বেশিদিন নয়, এর বছর পাঁচেক পরেই মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে থাকাকালীন পুজোর ছুটিতে যখন হোস্টেলের মেস বন্ধ থাকত, আমাদেরই এক বন্ধু বউবাজারের মোড়ে দোতলায় একটি বিখ্যাত ভাতের হোটেলে সামান্য মাছ-ভাত খেয়ে পকেটে হাত দিয়ে দেখতে পায় সে টাকা নিয়ে

যেতে ভুলে গেছে। প্রতিদিনই তাকে হোটেল মালিক ওখানে খেতে যেতে দেখা সত্ত্বেও এবং নিজের পরিচয় দেওয়ার পরেও শার্টটা খুলে রেখে আসতে বাধ্য করেছিলেন, যা সে টাকা মিটিয়ে দেবার পরই ফেরত পায়। লক্ষণীয় খবরটা জানাজানি হবার পর আমরা ও হোটেলকে বর্জন করেছিলাম। কিন্তু এখন হলে হোটেলের টেবিল-চেয়ার বৈঠকখানা বাজারে গড়াগড়ি যেত।

প্রিমেডিক্যাল পড়বার সময় হিন্দু হোস্টেলে একবছর ছিলাম। অসংখ্য স্মৃতি। সামান্য বৃষ্টিতেই নদীর নামটি কলেজ স্ট্রিট। বন্ধুরা মিলে হইহই করে গলিপথটুকু পার হয়ে কলেজ স্ট্রিট। আমাদের পাজামা গুটিয়ে হাঁটুর ওপর। কিন্তু দ্রষ্টব্য সেইসব সুন্দরী, যারা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে জল দেখে প্রথমে ভ্রূ কপালে তুলবে, তারপর তুলতে শুরু করবে শাড়ি। তুলতে তুলতে হাঁটু অবধি পৌঁছলেই যখন নজরে পড়বে সেই দৃশ্য মন দিয়ে দেখতে থাকা কয়েকটি সদ্য যুবককে, শাড়ি ছেড়ে দেবে জলে, আমরাও হতাশ হয়ে মনোনিবেশ করব অন্য কোনও নারীতে। সেই কলেজ স্ট্রিট আছে। সেই কল্লোলিনী জলপ্রবাহও আছে। শাড়ি নেই। সালোয়ার-কামিজ, প্যান্ট-টপ ও তোলাতুলি নেই। দেখবার মানুষও নেই।

কাছাকাছি সময়েই বইপাড়া দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। সঙ্গী বন্ধু, বাংলায় অনার্স, প্রেসিডেন্সি, সেইবছর তার বিভাগে তার শ্রেমিতে সে একাই পুং, অতএব আমরা হিংসায় মরে যাচ্ছি, ভানুসিংহের পদাবলি বিষয়ে স্বরসপ্তকে কী যেন বলতে বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ গম্ভীর কণ্ঠস্বর, 'এই যে ভাই, এ'দিকে শোনো।'

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম একটা বইয়ের দোকানের সামনে টুলে বসে পা দোলাতে দোলাতে এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক ডাক দিয়েছেন।

'আমাকে? কিছু বলছেন?'

'হ্যাঁ, তোমাকেই। ওটা ভানুসিংহের পদাবলি নয়, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলি, ভুল বলছ কেন?'

'জ্ঞান দিচ্ছেন?'

'ধরো তাই, বাড়ি গিয়ে মিলিয়ে নিও।'

হোস্টেলে ফিরে মিলিয়ে নিয়ে মুখ কালো করে বন্ধু বলেছিল, 'জ্ঞানদা ঠিকই বলেছে রে, ওটা ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলি।'

কিছুদিন আগেকার ঘটনা, নিজের লেখা স্টোরির জন্য "গুরুদেব" বইটার খোঁজ করছিলাম। শনিবারের সন্ধে, সব বন্ধ। বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিটের একটামাত্র পুরনো বইয়ের দোকান খোলা।

প্রশ্ন এল, 'কী বই খুঁজছেন?'

'গুরুদেব'— তারপরই মুখ ফস্কে, 'রানী মহলানবিশ'।

তখন আমরা নাইট শোয়ে সাহেবপাড়ায় সিনেমা দেখতে যেতাম—লেখক

'রানী চন্দ। দাঁড়াও এনে দিচ্ছি।'

কলেজ স্ট্রিট, তার বইপাড়া, চরিত্র বদলায়নি। দুঃখ পাব, সে যদি ছিমছাম কংক্রিটের ইমারতে আস্তানা বদল করে।

প্রিমেডিক্যাল বলে একটা পদার্থ আমাদের সময়ে ডাক্তারিতে ছিল। উচ্চমাধ্যমিকে যা যা পড়ানো হত সেগুলোরই চর্বিতচর্বন। উদ্দেশ্য একটা মূল্যবান বছর জীবন থেকে খুবলে নেওয়া। কিন্তু প্রিমেডিক্যাল পড়ার সময়ই কলকাতা শহরের সঙ্গে প্রথম পরিচিতির সুযোগ ঘটত। কলকাতাবাসের প্রথম কটা দিন, যখনও হস্টেল পাইনি, বরানগরে মহারাজা নন্দকুমার রোডে বড়মাসির কাছে থাকতে হয়েছিল। বাড়ি থেকে সাত-আট মিনিট হেঁটে তাঁতি পাড়া। সেখান থেকে ৩৪ নম্বর সরকারি বাসে ওয়েলিংটন স্কোয়ার। ওয়েলিংটনের কাছেই মৌলানা আজাদ কলেজ। মনে পড়ে ঠিক ন'টায় একটা বাস তাঁতিপাড়া পৌঁছত। ন'টা পঁয়ত্রিশে বাস থেকে ওয়েলিংটনে নামতাম। পৌনে দশটায় কলেজ, দশটা থেকে ক্লাস। পাঁচমিনিটের বেশি কখনো এদিক ওদিক হয়নি। ক'দিন আগে খবর পেলাম, মেসো অসুস্থ। সরকারি পরিবহন নয়, দস্তুর মতো না থামা গাড়িতে পুরো রাস্তা গেলাম। পুরনো স্টেট্‌সম্যান হাউস থেকে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ হয়ে শ্যামবাজার, সেখান থেকে বিটিরোড-সিঁথি-গোপাললাল ঠাকুর রোড-তাঁতিপাড়া, পাক্কা একঘণ্টা আঠারো মিনিট, সভ্যতার অন্যতম লক্ষণ দ্রুতি। কলকাতা কতখানি সভ্য হয়েছে মিলিয়ে নিন।

আগেই বলেছি, প্রিমেডিক্যালে পড়ার সময় হিন্দু হোস্টেলে থাকতে হয়েছিল। হিন্দু হোস্টেল, হোস্টেল হিসেবে অতুলনীয়। বাড়ির গন্ধ গা থেকে ঘষে তুলে আবাসিক করে তুলতে হিন্দু হোস্টেলের কোনও জুড়ি ছিল না। হোস্টেলের যিনি সাধারণ সম্পাদক, একদিন সবাইকে ডেকে বললেন, কাল সকালসকাল তৈরি থাকিস, এক জায়গায় যেতে হবে। কোথায় যাওয়া, কেন যাওয়া প্রশ্নগুলি অবান্তর। সবাই মিলে যাওয়া হবে, উত্তেজনায় রাতে ঘুমই এল না।

সাতসকালে হোস্টেলের সামনে তিনখানা মস্তমস্ত লরি। জলখাবার খেয়েই হইহই করে ট্রাকের পেছনে ওঠা হল। ট্রাক ছুটল ঝড়ের গতিতে। ঠান্ডা হাওয়ায় চুল উড়ছে, ট্রাক বাঁক নিচ্ছে, আমরা এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ছি, সে এক অনাস্বাদিত আনন্দ। হঠাৎ আমহার্স্ট স্ট্রিটে এসে ট্রাক দাঁড়িয়ে গেল। শুধু আমাদেরটাই নয়। পরপর তিনখানা ট্রাক। দাদারা সামনে ড্রাইভারের পাশে বসেছিল। ট্রাক দাঁড়াতেই নেমে গেল। গেল তো গেলই। আধঘণ্টা, পঁয়তাল্লিশ মিনিট, একঘণ্টা। এদিকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের পায়ে ব্যথা, রোদ চড়ে মাথার ওপর। গরমে দরদর করে ঘামছি, সকলের সেই উৎসাহ উধাও। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর, ছোট বাইরে করার নাম করে ট্রাক থেকে নেমে আমি আর এক বন্ধু পাশের একটা গলি ধরে এঁকে বেঁকে সোজা কলেজ স্কোয়ার। ঘণ্টা দুই সেখানে কাটিয়ে আর ধরা পড়ার সম্ভাবনা নেই বুঝে, সোজা হোস্টেল।

সম্পাদকের ঘরে ডাক পড়ল। রাত্তিরে শুধু আমার। মিথ্যে বলব না, হাঁটু দুখানা ঠকঠক করে কাঁপছিল। দাদার চোখদুটো টকটকে লাল, পরিশ্রম, রোদ না অন্য কিছুতে বলতে পারব না। সরাসরি আমার ওপর চোখ দুটো স্থাপন করে দাদা যা বলেছিলেন, আজও মনে আছে—'তুই কি ভেবেছিস আমাদেরই যেতে খুব ভালো লেগেছে? না। না গিয়ে উপায় নেই তাই গেছি। ঘরে যা। ওইভাবে রাস্তা থেকে না বলে চলে যাস না। হাজারহোক তোদের দায়িত্ব তো আমার। হঠাৎ হারিয়ে গেলি, কোথায় গেলি, রিস্ক তো একটা থেকেই যায়।'

পরে জেনেছি, বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়-ছাত্রাবাস থেকে ট্রাকভর্তি সরলমতি শিক্ষার্থীদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বিমানবন্দরে। সেখানে অবতরণ করেছিলেন রাজকুমার। তাঁকে ছাত্রসমাজ সংবর্ধনা জানিয়েছিল। আমার নিজের চোখে দেখা নয়, সত্যাসত্য বলতে পারব না, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে হাজির ছিল এক দাদা চারনম্বর ওয়ার্ডের বীরেনের ক্যান্টিনে খাটিয়াতে পা দোলাতে দোলাতে বলেছিল, 'রাজপুত্র নাকি সংবর্ধনার অনুষ্ঠানেও গিয়েছিলেন এবং তাঁকে দেখে তদানীন্তন উপাচার্য জোব্বাসমেত উঠে দাঁড়িয়েছিলেন।'

এখন মনে হয়, উপাচার্য যদি তাই করে থাকেন, অন্যায় কিছু করেননি। উপাচার্য পদটির মর্যাদা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে, তার একটি ঝলক আমরা পাই একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের মেয়াদশেষের দিনটি যখন ছাত্র-ছাত্রী আশ্রমিকদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণের মধ্য দিয়ে উৎসব আকারে পালিত হয়। তারও আগের একটি ঘটনা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করে প্রসঙ্গে যতি টানব। আমার একটি-দুটি লেখা তখন পত্রপত্রিকায় প্রকাশ পাচ্ছে, আমাদের এক বন্ধু ঝড়ের মতো হোস্টেলের ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁরে, তুই ভিসি হতে চাস?'

প্রশ্নের ধাক্কায় যখন আমি বেসামাল, বন্ধু খোলসা করেছিল, 'হতে চাইলে একটা জীবনী লিখে ফেল।'

'জীবনী? কার জীবনী?'

'কোনও প্রধানমন্ত্রী অথবা মুখ্যমন্ত্রীর।'

অসহায় হয়ে বললাম, 'কিন্তু আমি তো 'একটি বটবৃক্ষের আত্মকথা' যা স্কুলে পরীক্ষার খাতায় লিখতে হয়েছিল, তার বাইরে কোনও জীবনী কখনো লিখিনি।'

বন্ধু ঠোঁট উল্টে বলল, 'তাহলে তোর দ্বারা হল না।'

'প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী পাব কোথায়?'

'পেতে তোকে হবেই। প্রধানমন্ত্রীর জীবনী লিখলে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, মুখ্যমন্ত্রীর জীবনী লিখলে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে, ভিসির চাকরি বাঁধা।'

আলোচনা বেশিদূর এগোয়নি, কারণ তখন কোনও মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী খালি ছিলেন না। কিন্তু বন্ধুর কথার নির্যাস থেকে উপাচার্য পদগুলি সম্বন্ধে এবং ওইসব পদে আসীন ব্যক্তিদের সম্বন্ধে একজন সাধারণ ছাত্রের ধারণা বুঝে নিতে অসুবিধা হচ্ছিল না।

কলকাতার শিক্ষাক্ষেত্রে বহিরঙ্গে যত বদলই ঘটুক, এই বিশেষ একটি স্থানে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মনোগত ধারণার খুব একটা বদল হয়েছে বলে মনে হয় না। আজ যখন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী (যাঁকে এই সময়ের একজন উল্লেখযোগ্য মধ্যব্যক্তিত্ব হিসেবে সমীহ করে) দূরদর্শনে বলেন, শিক্ষাকে রাজনীতিকরণের কলুষ থেকে মুক্ত করার ব্রত তিনি নিয়েছেন, তখন একটি কথা বারবার মনে হয়, যেসব শিক্ষাব্রতী উপাচার্য হয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে কীর্তিমান সন্দেহ নেই। কিন্তু আচার্য যদুনাথ সরকার, আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অম্লান দত্তের মতো বড় মাপের শিক্ষাব্রতীর যেখানে সত্যিই অভাব, উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন যোগ্যতাটি সবচেয়ে জরুরি, স্বক্ষেত্রে তাঁর ব্যুৎপত্তি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় তাঁর সাফল্য নাকি একটি অঙ্গের উল্লেখযোগ্য অনুপস্থিতি, যার নাম মেরুদণ্ড।

কলেজে রিইউনিয়ন সোশালে নাটক হল। নিজেরা নাটক করেছি, বাকি ইতিহাস, ছোট বকুলপুরের যাত্রী। বাইরে থেকে নাট্যদল এসে করে গেছেন দান সাগর, নরক গুলজার, হঠাৎ খবর এল, নাটকের ভগবান তাঁর নিদ্রাভঙ্গ করে আবার মঞ্চে পদার্পণ করতে রাজি হয়েছেন। ছুটছুট, যেদিন সকাল আটটায় টিকিট বিলি তার আগের দিন থেকে অ্যাকাডেমির সামনে লাইন। ঘণ্টায় ঘণ্টায় রোলকল। পালিয়ে যাবার জো নেই। সারারাত কম্বলজড়িয়ে ভিক্টোরিয়ার সামনে ঘোরাঘুরি। সকালে কাউন্টার খুললে হাতে একখানা টিকিট, একটা স্বর্গের ছাড়পত্র। তারপর নাটক। চোখে ভালো দেখতেন না বলে মঞ্চে দাগ কেটে রাখা থাকত। তাঁর মঞ্চ ব্যবহার স্বরক্ষেপণ, অভিনয়ের বহুমাত্রিকতা, পরে যখন তাঁর স্বলিখিত নাটকের পাঠ শুনতে গেছি, এখই অভিজ্ঞতা। সেই রাত জেগে টিকিট কাটা থেকে অভিভূত হওয়া পর্যন্ত।

কিছুদিন আগে একটি নাটক সম্বন্ধে অনেকের কাছে প্রশংসা শুনে ছুটির দিনে যাওয়াই মনস্থ করলাম। হলের কাছাকাছি গিয়ে অনেক মানুষের ভিড় দেখে ভালো লাগল, যাক নাটক সম্বন্ধে এখনো মানুষের এত আগ্রহ! ও হরি, শেষে জানা গেল, এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের ছবির প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষেই নাকি জনসমাগম। হলের ভেতরে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল নিঃসঙ্গতা, বহুদিন আগে জ্যোতি সিনেমায় একা একা কুরোসাওয়ার 'দেরসু টজালা' দেখেছিলাম। অবিশ্বাস্য সেই অভিজ্ঞতায় জারিত হতে হতে মনে হয়েছিল, দেরসু যেন তার উপাখ্যান একা আমার কাছেই বিবৃত করছে। এই নাটকে নিঃসঙ্গতা ছিল, কারণ দর্শকের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা। কিন্তু নাটক দেখতে দেখতে কখনোই মনে হয়নি, এই আড়াইঘণ্টা আমি নাটকটা না দেখলে জীবনের কোনও স্মরণীয় অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হতাম। বয়েস? দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন? নাটক বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা? হয়তো সবগুলোই।

যখন মেডিক্যাল কলেজে পড়ি। সপ্তাহান্তে বাবা-মায়ের কাছে বর্ধমানে চলে যেতাম। সোমবার ভোরের লোকালট্রেন ধরে সকাল ৮টায় হাওড়া। সেখান থেকে সরাসরি বাসে কলেজ স্ট্রিট। যেহেতু ভোরের ট্রেন, অর্ধেক মানুষই রাতের অবশিষ্ট ঘুমটুকু ট্রেনেই উশুল করত। আমিও কৌশলটা রপ্ত করে নিয়েছিলাম। একদিন শীতের সকাল, ট্রেন ডানকুনির কাছাকাছি পৌঁছেছে, হঠাৎই ট্রেনের অন্যপাশে সোরগোল। একজন দেখে এসে বললেন অজ্ঞান হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করে জানা গেল, এক বৃদ্ধ সহযাত্রী হঠাৎই ট্রেনে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে বসবার সিটেই শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। মনে হয় জ্ঞান নেই। যতদূর মনে পড়ে তখন ফিফথ ইয়ারে পড়ি। নিজেকে ডাক্তার ভাবতে শুরু করে দিয়েছি। তাড়াতাড়ি অন্যদের সরিয়ে দেখতে গেলাম। সঙ্গে স্টেথোস্কোপটা ছিল। সেটা বুকে লাগিয়ে হৃৎস্পন্দন শুনলাম, মনে হল হৃদগতি ধীর।

পেসমেকারের কেস হতে পারে। সহযাত্রীদের সেই কথা জানালাম। এও জানালাম, ওনাকে এখনই ভর্তি করা দরকার।

সহযাত্রীরা আমার পরিচয় জানতে চাইলে বললাম, আমি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র, হাসপাতালে ভর্তির ব্যাপারে সাধ্যমতো চেষ্টা করব। হাওড়া স্টেশনে ট্রেন ঢুকলে কয়েকজন দৌড়ে স্ট্রেচার নিয়ে এলেন, অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা হল না। ট্যাক্সির পেছনের সিটে ভদ্রলোককে শুইয়ে মাথাটা কোলে নিয়ে আমি বসলাম। সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে বসলেন আর একজন। পেছন পেছন আর একটা ট্যাক্সিতে চললেন আরও চার-পাঁচজন। মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির বন্দোবস্ত হলে ওষুধের প্রেসক্রিপশন নিয়ে দোকানে গেলেন দুজন। অন্য দুজন বাড়িতে খবর দিতে ছুটলেন। সন্ধ্যার মধ্যে অসুস্থ মানুষটি চোখ খুলে তাকিয়ে তাঁর ঘনিষ্ঠদের পাশে দেখতে পেলেন।

মনে আছে, মানুষটি ভর্তি হয়ে যাবার পর আমি একবার বলেছিলাম, 'আমি তো আছিই, আপনাদের অফিস...।' একজন দাবড়ানি দিয়ে আমাকে থামিয়ে দিয়েছিলেন, 'একটা মানুষ মরে যাচ্ছে, আর আমার অফিস?'

এখনকার কলকাতার পথদুর্ঘটনায় মানুষ রাস্তায় পড়ে থাকলে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়াই রীতি। কেউ থামলে বুঝতে হবে সে হয় পকেটমার নয় বাইক চোর। মিনিবাসে একটি মেয়েকে তিনজন উত্তক্ত করছিল, বাকি চল্লিশজন যাত্রী হঠাৎই ব্যস্ত হয়ে জানলার বাইরে প্রকৃতির শোভা দেখতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন এ আমার নিজের দেখা। ইভটিজিং-এর প্রতিবাদ করলে কোনও যুবক যখন নিগৃহীত হয়, মানুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে, কোনও প্রতিবাদের ভাষা তাদের মুখ থেকে নির্গত হয় না। অথচ হাসপাতালে কোনও মরণাপন্ন রোগী মারা গেলে ডাক্তারকে ধরে গণপিটুনি দেবার সময় প্রতিবাদ হাত পায়ের পেশিতে ঝলসে ওঠে। সেই হাসপাতালেই লিফট থেকে ইমার্জেন্সি সর্বত্র থুথু কিংবা পানের পিক ফেলার সময় হাসপাতাল আমাদের এই চিন্তাটাই আমাদের মাথা থেকে উবে যায়। হ্যাঁ, আরও একটা তফাত। ওই বৃদ্ধকে হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে আনলে এখন রোগীর অবস্থা বিচারের আগে জানতে চাওয়া হয় তিনি মরতে মরতেও উপযুক্ত কারও কাছ থেকে কোনও চিঠি আনতে পেরেছেন কী না?

এল নাইন ডবলডেকার বাস তখন চলত ডানলপ ব্রিজ থেকে গোলপার্ক। এই লাইনের দোতলায় উঠে সাদার্ন অ্যাভিনিউ ধরে লেককে একপাশে রেখে যাত্রার পথটুকু ছিল বিশেষ অভিজ্ঞতা। ঝুঁকে পড়া গাছের ডাল জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিত, বর্ষায় হঠাৎ হঠাৎ ভেসে আসত কদমফুলের গন্ধ, চৈত্রে গাছের মাথা লাল হয়ে

থাকত অশোকে, পলাশে, ময়দানের বুক চিরে ট্রাম যাত্রাও ছিল আমাদের আর এক আনন্দ। এর কোনওটার জন্যই পকেটের জোর দরকার হত না। মূল্যবান আনন্দের প্রতি মানুষের আকর্ষণ যত বেড়েছে পুরনো কলকাতার এই আভিজাত্যগুলোও বিদায় নিতে শুরু করেছে। ডবলডেকার বাস, উঠে গিয়েছে, ট্রাম যেতে গিয়েও সুতোর ওপর ঝুলছে।

কমদামি আনন্দের কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ল, তখন আমরা নাইটশোয়ে সাহেব পাড়ায় সিনেমা দেখতে যেতাম। পঁচাত্তর পয়সার লাইনে দাঁড়িয়ে ধাক্কাধাক্কি করে নিউ এম্পায়ারের দোতলায় সিঁড়িতে বসে এন্টার দ্য ড্রাগন দেখেছি। ফেরার পথে রয়েলের চাঁপ কিনে ভাগাভাগি করে খেয়েছি। এখন আইনক্সে সিনেমা দেখতে গেলে পুরোপরিবারের টিকিট খরচ প্রায় মধ্যবিত্তের এক মাসের মাইনে। একের পর এক শপিং মল মাথা তুলছে। ভিড় থইথই। অথচ পুজোর বাজার মানে তখন ছিল খুদুর দোকানে শাড়ির দাম পাঁচটাকা কমানোর জন্য ধস্তাধস্তি। ফিক্সড প্রাইস মল শাড়ি কেনার আসল আনন্দটাই কেড়ে নিয়েছে।

বন্ধু বাড়িতে রাতের মিলটা ম্যানেজ করে হাতিবাগান থেকে রাতের শেষ ট্রামে হোস্টেলে ফিরতে ফিরতে দেখতাম গলিতে-রকে-চায়ের দোকানে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল, জ্যোতিবসু-সিদ্ধার্থ রায় গমগম করছে। এখন যেখানে থাকি, সেই প্রায় দক্ষিণ কলকাতায় রোগী দেখে রাতে বাড়ি ফেরার সময় ঝকঝকে বুলেভার্ড আর সুশোভিত আলোকসজ্জায় কোনও মেসি-ফেডেরার-তেন্ডুলকারকে ধ্বনিত হতে শুনি না।

ছত্রিশ বছর হয়ে গেল কলকাতায়। অর্ধেক জীবন। কলকাতাতেই আমার জন্ম। আমার জীবনসঙ্গী নির্বাচন, ভালোবাসা কলকাতায়। আমার সন্তানদের জন্মও এখানেই, হয়তো আমার শেষশয্যাও এখানেই পাতা রয়েছে। তথাপি কলকাতাকে কেন যেন নিজের শহর বলে এখনও মনে হয় না। মনে হয় কলকাতা বড় নিষ্ঠুর, বড় হৃদয়হীন, যে আবাসনে থাকি, তার নীচের তলায় প্রতিবেশীর অসুস্থতার খবর পেতেও এক সপ্তাহ দেরি হয়ে যায়। কল্পনা করি, এই শহরকে দেওয়াল, তারও পরে দেওয়াল, আরও দেওয়াল দিয়ে টুকরো টুকরো করে যে স্বার্থপর প্রকোষ্ঠগুলি আমরা নির্মাণ করেছি যার মধ্যে থাকতে থাকতে একে অপরের উদ্দেশে হাত বাড়িয়ে দিতে আমরা ভুলে গিয়েছি, সেই দেওয়ালের প্রতিবন্ধক একদিন উঠে যাবে। এক কলকাতার আকাশে নীচে দাঁড়িয়ে এক কলকাতার মাটিতে পা রেখে আমরা কখনও হয়তো শহরটাকে আমাদের বলে চিনে নিতে পারব।